: উপসংহার :

অজিত দত্তের প্রধান পরিচয় তিনি কবি। তিরিশের দশকে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে যুগ্মভাবে ''প্রগতি' পত্রিকা সম্পাদনা সূত্রে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব। এবং ঢাকায় বসে দুজনে আধুনিক কবিতা আন্দোলন শুরু করেছিলেন হাতে লেখা এই 'প্রগতি' পত্রিকার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে ১৯২৭ সালে প্রকাশিত মুদ্রিত আকারে 'প্রগতি' পত্রিকা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু নিজেই জানিয়েছেন —

> "... বন্ধুরা মিলে স্থির করা গেল হস্তলিপি - পত্রিকা আর নয়, এবারে একটি মুদ্রাযন্ত্র নিঃসৃত দস্তুর মাফিক মাসিকপত্র চাই। আমরা এই সিদ্ধান্ত নেবার মাস দুয়েকের মধ্যে আষাঢ় মাসের কোন এক দিনে আমার এবং টুনুর যৌথ সম্পাদনায় - এবং প্রধানত এই দু-জনেরই আর্থিক দায়িত্বে - 'প্রগতি'র প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করলো।"[১]

আধুনিক কবিতা আন্দোলনে ও এর প্রচার প্রতিষ্ঠায় 'কবিতা' পত্রিকার নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। এই ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকাটিরও প্রথম সূত্রপাত ও প্রতিষ্ঠায় অন্যান্যদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে ছিলেন অজিত দত্ত। এবং এই কবিতা পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই সেই সময়ে গড়ে ওঠে একটি কবি ও লেখক গোষ্ঠি। যাইহোক কবিতার আষাঢ় ১৩৪৮ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে এক জায়গায় বুদ্ধদেব বসু লিখছেন —

> "... বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অজিত দত্ত, দেবীপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নানা ভাবে 'কবিতা'কে সাহায্য করে আসছেন।"[২]

বস্তুত ১৯২১ সালে ঢাকার কিশোরীলাল জুবলী কলেজিয়েট স্কুলে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় হয়, তাই পরবর্তী সময়ে গভীর বন্ধুত্বের রূপ পায়। অন্যদিকে স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তিনি নিয়মিত ভাবে 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। এবং সেই সূত্রেই

পরিচিত হন মনীশ ঘটকের সঙ্গে। এবং তাঁরই অনুরোধে 'কল্লোল' পত্রিকায় লেখা শুরু করেন। ঢাকাতেই আই.এ. পড়ার সময় প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধু ও সহপাঠী হিসেবে পান অমলেন্দু বসু, পরিমল রায় প্রমুখ কৃতী ব্যক্তিদের নিবিড় সান্নিধ্য।

এম.এ. ক্লাসের ছাত্রাবস্থায় ১৯৩০ সালে ডি.এম লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কুসুমের মাস'। কবির বয়স তখন ২৩ বছর। বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মৃদুভাষী রোমান্টিক কবি হিসেবে পরিচিত হন। বাংলা কাব্যে রোমান্টিকতার নতুন সুর সংযোজিত হয় তাঁর এই সময়ে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যৌবনেই কবি সক্রিয়ভাবে আধুনিক কাব্য আন্দোলন ও নিজস্ব গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে একটি স্থায়ী আবেদন রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। ঈর্ষণীয় বন্ধুভাগ্যও তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি ক্রমশঃ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে বিযুক্ত হন। অবশ্য তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও কিছুটা নির্জনতাপ্রিয় ছিলেন।

'কুসুমের মাস' প্রকাশের পর পরই অজিত দত্ত কলকাতায় স্থায়ীভাবে চলে আসেন। জমিদার বংশের সন্তান এসে ওঠেন উত্তর কলকাতার এক সাধারণ ভাড়াবাড়ীতে। তারপর নানা মেসবাড়ী ও বাসা বদল করতে করতে অবশেষে ১৯৩৮ সালে 'কবিতাভবনে'র তিন তলায় তিনি স্থায়ী হন। ঐ বছরই প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বই 'পাতালকন্যা'। ততদিনে কার্যত 'কবিতা' পত্রিকার সংগে তাঁর সম্পাদকীয় যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কেননা প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পরই বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সাহিত্য তত্ত্বগত ও অন্যবিধ নানা কারণে মতান্তর হয়। অন্যদিকে প্রচার প্রতিষ্ঠাগত বানিজ্যিক বিষয়গুলোতেও অজিত দত্ত নিজেকে ঠিক ঠিক উপযুক্ত তো করেনই নি। বরং এসবের ঘোর বিরোধীই ছিলেন বলা যায়। আত্মপ্রচারসর্বস্ব যুগে বসবাস করেও এভাবে নিজেকে সবদিক থেকে গুটিয়ে রাখার ফলে সেই সময়ের একজন অন্যতম প্রধান কবি হয়েও প্রায় অপ্রচারিত রয়ে গিয়েছেন। তবে ছেলেবেলার বন্ধু বুদ্ধদেবের সঙ্গে নানা মতান্তর ক্রমে তাঁকে যে কিছুটা

অভিমানী করে তুলেছিল তা বলায় কোন অসুবিধে নেই। কেননা ২০২ রাসবিহারী এ্যাভিনিউ-এর একই বাড়ীতে দীর্ঘকাল একত্রে বসবাস করেও দুজনের মধ্যে তেমন কোন নিয়মিত ও হার্দিক যোগাযোগ আর ছিল না। বুদ্ধদেব বসুর ঘরে নিয়মিত তুমুল বিশুদ্ধ সাহিত্যিক আড্ডায় অজিত দত্তের উপস্থিতি বিরল ছিল। হয়ত জীবনের মধ্যসীমায় পৌঁছে দুজনেই দুজনকে এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে থাকবেন।

কলকাতায় বসবাসকালে চাকরী জীবনের প্রথম পর্বে রিপন স্কুলে শিক্ষকতা বা একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে *Publicity Officer* হয়ে চাকরী সূত্রে সময়াভাব হলেও ১৯৪৫ সালে তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নষ্টচাঁদ' প্রকাশিত হয়। নাগরিক জীবনের কোলাহল যে তার রোমান্টিক কবি হৃদয়কে যন্ত্রনাবিদ্ধ করে তুলেছিল তা স্পষ্টরূপে এখানে বর্ণিত - প্রকাশিত। ইতিমধ্যে ১৯৪৩ সালে চাকুরীহীন অবস্থায় প্রকাশ করেছেন 'দিগন্ত' পত্রিকা। একই সঙ্গে 'দিগন্ত পাবলিশার্স' প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন করেন। পত্রিকা ও প্রকাশনা সূত্রে এই সময়ে তিনি কিছুদিনের জন্য আবার ব্যক্তিগত প্রবণতার প্রায় বিরুদ্ধে সাহিত্যিকমহলে যুক্ত হয়ে যান। যদিও সে সময়কাল মাত্র চার বছর। তবে এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় মনোযোগ দাবী করে। তা হলো, এই প্রকাশনা থেকেই সেকালের প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় লেখকদের একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সন্তোষকুমার ঘোষ, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, লীলা মজুমদার, মনীন্দ্রলাল বসু প্রমুখ লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশ করলেও প্রকাশনা তাঁর কাছে নিছক ব্যবসায়িক বিচার বুদ্ধি নয়, এও তাঁর সাহিত্যকর্মের মত নীরব সাধনা ছিল। কবির মানসিক গঠন বোঝার পক্ষে এই বিষয়টি জরুরী। যাইহোক সেই সময়ে তাঁর নিজেরও কয়েকটি গ্রন্থ তিনি এখান থেকেই প্রকাশ করেন। 'নষ্টচাঁদ' ছাড়াও 'ছায়ার আল্পনা' 'ছড়ার বই' রম্যরচনাগ্রন্থ 'মন পবনের নাও' ইত্যাদি।

অবশেষে তিনি চন্দননগর গর্ভনমেন্ট কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজে হয়ে ১৯৫৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দেন। এই পর্বে আমরা কবির সঙ্গে গদ্য লেখক-সমালোচক-সাহিত্যতত্ত্বের আলোচক অজিত দত্তকে আবিষ্কার করি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে তিনি লেখেন 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' ১৯৬০ সালে। তিনি এতকাল বিশুদ্ধ

কাব্যচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন — এখন থেকে তার সঙ্গে যুক্ত হলো গবেষক-প্রাবন্ধিক-সমালোচক সত্তা। প্রসঙ্গত বলা যায় আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রবিরোধী (বুদ্ধদেব বসুর বন্ধু হিসেবে তিনিও) এমন একটি ধারনা প্রচলিত থাকলেও এই ধারনা যে অসার তা রবীন্দ্র সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ বা আলোচনায় তিনি প্রমাণ করেছেন। সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা আমরা যথাস্থানে করেছি।

অজিত দত্ত বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা সাহিত্যের অগ্রজদের বিষয়ে তাঁর কৌতূহল ছিল। আর এই সময়কালেই তিনি রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, রঙ্গলাল, গোবিন্দচন্দ্র দাস, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সরোজিনী নাইডু, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, রাজশেখর বসু, সুকুমার রায় প্রমুখ কবি সাহিত্যিকদের রচনার বিশ্লেষণ - মূল্যায়ণ করতে শুরু করেন। পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক ও সাহিত্যতত্ত্ব-মতবাদ বিষয়ক অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রসঙ্গত আমরা বলতে পারি 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' গ্রন্থটি ছাড়া বাকি এই বিপুল রচনার কোনটিই অধ্যাপনা সূত্রে বা ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে লেখা নয়। এই সব রচনায় তাঁর পাণ্ডিত্য-মনন ইত্যাদির সঙ্গের কবিহৃদয় যুক্ত হয়েছে বলা যায়।

ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ ও একটি রম্যরচনা গ্রন্থ। যথাক্রমে 'পুনর্ণবা' (১৯৫০) ও 'জানালা'(১৯৫১) এবং 'জনান্তিকে'(১৯৪৯)। সব কটি গ্রন্থেই তাঁর নিজস্বতা মুদ্রিত। এবং বোঝা যায় যে তিনি সন্তর্পণে একাই কাব্যরচনা করেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠাভূমি সমকালীন অন্যদের সঙ্গে একই পংক্তিতে নেই।

সংসার জীবনে প্রায় সব অর্থে সফল অজিত দত্ত কাব্য-সাহিত্যের জগতে সেই অর্থে ছিলেন ততটাই অসফল। আর তথাকথিত সেই অসাফল্যের মূলে ছিল স্বেচ্ছা-নির্বাসন। অবশ্য এই নির্বাসনের জন্য কোন অভিযোগ-অনুযোগের খবর আমাদের হাতে নেই। তবু একটা অভিমান যে ছিল সেকথা আমরা আগেই বলেছি। তবে তার কোন সরব প্রকাশ জানা যায় না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মানসিক গঠনই ছিল আত্মমগ্নতার তথা একাকীত্বের অনুকূল। এবং নানা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কবিতায় 'ইনটেলেকট্'-এর নতুন ফ্যাশান'কে তিনি তাঁর কাব্যে গ্রহণ করেননি। তাই একদা 'কুসুমের মাস'-এর

বিখ্যাত কবিকে ভুলে যেতে পাঠকদের বেশী সময় লাগেনি। তিনি নিজেই জানিয়েছেন -

"... কিন্তু অনেক সময়ে মনে হয়েছে যে ও-জাতীয় মন নিয়ে এ-যুগে
কবি হতে গিয়ে বোধহয় আমি কালবিপর্যয়ের এক উদাহরণ হয়ে রইলাম।"[৩]

আমরা তাঁর জীবনী আলোচনা সূত্রে বলেছি যে আমাদের দেশে নাম-যশ-প্রচার-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিভা যথেষ্ট নয়। এ সবের জন্য যা বেশী দরকার সেই বিপুল জনসংযোগ - গোষ্ঠিভুক্তি-আত্মপ্রচার-ধরাধরি ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা, আগ্রহ ছিল না কোনদিনই। তাছাড়া সমকালে সতীর্থদের মত অনর্গল লিখে যাওয়া বা ফরমায়েশী রচনাকর্ম এগুলোর কোনটিতেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। আর এভাবেই 'কুসুমের মাস'-এর নির্জনতাপ্রিয় শান্ত স্বভাবের অজিত দত্ত আস্তে আস্তে নিজেকে আড়ালে সরিয়ে নিয়েছেন কাব্যজগতের তৎকালীন ব্যস্ততাময় প্রধান জায়গা থেকে। তাঁর নিজের সেই কবিতাটি এক্ষেত্রে আবার উচ্চারণ করছি —

"সমস্ত পৃথিবী নয়, সমস্ত আকাশ নয়,
নয় আদিগন্ত মাঠ, সিন্ধু-গিরি-মালা,
হীনপ্রভ চোখে শুধু একখন্ড বিশ্বরূপ —
কাঠের সীমানা আঁটা একটি জানালা।"

আমরা দেখেছি এদেশে 'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি একে সমর্থন করলেও অচিরেই অন্য অনেকের মত তাঁরও মোহভঙ্গ ঘটে যায়। আসলে তাঁর কবিতার-মননের যে গড়ন, তা 'প্রগতি লেখক সংঘের' উদ্দেশ্যের সঙ্গে কোনভাবেই মানানসই ছিল না। 'কুসুমের মাস', 'ছায়ার আল্পনা', 'পুণর্নবা' ইত্যাদি গ্রন্থের কবিতাগুলিতে সঠিকভাবে তার কবি হৃদয় উন্মুক্ত হতে পেরেছে। সে পথ নির্জন, নিঃসঙ্গ রোমান্টিক কল্পনার জগৎ। যুগের বা সময়ের সাময়িক চাহিদা পূরণে তা ব্যর্থ। সে সংকল্পও তিনি কোনদিন নেননি। এমনকি তাঁর সাহিত্যে তত্ত্ব ও সমালোচনামূলক গদ্য রচনাতেও তাঁর এই বিশিষ্ট ও ট্র্যাডিশনাল মানসিকতার ছাপ সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। তাই তিনি স্বচ্ছন্দে লিখতে পারেন —

"... মানুষের ব্যষ্টিকে তাই কাব্যে সাহিত্যে সবচেয়ে বড়ো সম্মান দিতে হয়, সমষ্টির প্রশ্ন ওঠে না। কেননা ব্যষ্টি নিয়েই সমষ্টি। ব্যক্তিগত প্রেম ও স্নেহ, দুঃখ ও আকাঙ্ক্ষা যদি সত্য হয়, তাহলে তা সমষ্টিকে স্পর্শ করে, আলোড়িত করে। মানুষকে বাদ দিয়ে সমাজ নেই - রাষ্ট্র ও অবান্তর।"[৪]

অথবা অন্য আর একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন —

" আজকের অধিকাংশ পাঠক কাব্য-সাহিত্য-ললিত কলার সূক্ষ্ম রসে কোনরূপ আকর্ষণ অনুভব করে না। সে চায় মতবাদ, সে খোঁজে রাজনৈতিক কর্মসূচী,- এবং এ সব জিনিস পদ্যাকারে গ্রথিত হলে সে তাকে কাব্য বলতে দ্বিধা করে না। সে চায় উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ তা সে গোয়েন্দা কাহিনীতেই হোক অথবা 'বিপ্লব' ও 'সংগ্রামে'ই হোক।"[৫]

সুতরাং তিনি যে যুগের প্রেক্ষিতে 'কালবিপর্যয়ের' উদাহরণ হয়ে থাকবেন তা আশ্চর্যের নয়। তাই স্মরণীয় হলেও তিনি জনপ্রিয় নন কোনভাবেই।

তিরিশের দশকে - আরো বিশেষভাবে বললে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই আমাদের দেশেও সামাজিক - অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক জীবনে বিপর্যয় লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন বিদেশী চিন্তাবিদ, বৈজ্ঞানিক, সমাজতত্ত্ববিদদের নতুন নতুন মতবাদ ও বিশ্লেষণ আমাদের নিত্য পরিচিত ব্যক্তি ও সমাজকে অচেনা ও জটিল করে তুলেছিল। পাল্টে যাওয়া মূল্যবোধকে গুছিয়ে সাহিত্যে-শিল্পে-কাব্যে উপস্থাপিত করলেন প্রায় সব কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা। অজিত দত্ত, আগেই বলেছি, কি গদ্যরচনায় (প্রবন্ধ ও অন্যান্য মননধর্মী রচনায়) কি কাব্যে এসবকে সেইভাবে বরণ করে চলতি স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেননি। সন্তর্পণে - নিঃশব্দে একে পাশ কাটিয়েছেন। অবশ্য সে কারণে তাঁকে অবাস্তব বা কল্পনাসর্বস্ব কবি বলাও যাবেনা। আসলে জীবনের সুস্থ ভোগ বাসনা-ঐতিহ্যকে লালিত করে নিজের হৃদয় ও মননকে এসবের প্রভাবহীন রেখে কবিতা বা গদ্য রচনায় নিজস্বতা এবং নিজের বিশ্বাসকে অবিচল করেছেন। তবে সাময়িক বিচলন ও অস্থির যুগযন্ত্রনার ছাপ 'নষ্টচাঁদ' কাব্যগ্রন্থকে বিশিষ্ট ও যুগোচিত মূর্তি দিলেও তিনি তাতেই স্থিত হতে পারেননি।

অন্যদিকে অজিত দত্ত অনেকটা পরিণত বয়সেই প্রবন্ধ, রম্যরচনা ইত্যাদি গদ্য লেখায় হাত দেন। এবং লঘু প্রবন্ধের বই হিসেবে 'জনান্তিকে' পড়ে রাজশেখর বসু প্রমুখ বিদগ্ধ জনের প্রশংসা পেয়েও বা 'মন পবনের নাও' লিখে সাধারণের যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেও তিনি নিজেকে এব্যাপারে সংবৃত করেছিলেন। ১৯৬৮ তে এই দুই গ্রন্থের সম্মিলিত রূপ 'সরস প্রবন্ধ' প্রকাশের পর আর একটিও এ জাতীয় হাস্যরসাত্মক রস রচনা লেখেননি। এ সবই তার সামাজিক জীবনের সেই অদ্ভুত নির্লিপ্ততার সঙ্গে একাত্ম ও সমান্তরাল।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে ১৯৭০ সালে চাকরী থেকে অবসর নিয়ে ঘরেই বাকি দিনগুলি কাটিয়েছেন। এই সময়ে তার শেষ কাব্যগ্রন্থ 'শাদা মেঘ কালো পাহাড়' প্রকাশিত হয়। কিন্তু তার পরে আর কোন গ্রন্থই প্রকাশিত হয় নি। হয়ত বা সেকারণেই জীবনের উপান্তে পৌঁছে তিনি লিখেছিলেন - "লিখবো, কিন্তু কার জন্য লিখবো - তা মাঝে মাঝে ভাবি।" জীবনে কোন পুরস্কার পাননি - সে দুঃখ বা মনোকষ্ট হয়ত হৃদয়ের কোন গভীর সীমানায় থাকলেও তাতে বিচলিত হয়ে আদর্শ ও বিশ্বাসচ্যুত হননি। এই গৌরব তাঁর প্রাপ্য। তাই অশক্ত শরীরেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবিতা লিখেছেন।

অজিত দত্ত সমকালের বন্ধু বুদ্ধদেব বসু ছাড়া আর কারো রচনায় তাঁর কবিতার আলোচনা দেখে যেতে পারেননি। পরবর্তীকালেও যে তাঁকে নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে সে প্রমাণও আমাদের হাতে নেই। অথচ তিনি আলোচনাযোগ্য কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন বলেই আমরা মনে করি।

প্রথম যৌবনের ব্যক্তিগত তীব্র অনুভবের, অবস্থার যে রোমান্টিক প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি কুসুমের মাসে, সারাজীবনের প্রায় সব কবিতায় সেই তীব্র অথচ স্নিগ্ধ, আলোকিত, কাম্য, আস্বাদিত অথচ বহুদূরের সুরের মতই মৃদু সুরভিত। আমাদের আকর্ষণযোগ্য এই হলো অজিত দত্তের কবিতার চরিত্রলক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য। জীবন যাপনের প্যাটার্নে আমরা এমনই এক বাহ্যজগৎ সম্পর্কে - সামাজিকভাবে প্রায় অমনোযোগী অজিত দত্তকেই দেখি। প্রতিষ্ঠা-প্রচার-নাম-যশ-পুরস্কার ইত্যাদি বিষয়ে উদাসীন এমন যার চরিত্র তাঁর কাছে সমকালের উত্তপ্ত বিষয় ও দর্শন আশ্রয়ী রচনা আমরা আশা করতে পারিনা। তিনিও লেখেননি। নিজেরই জীবন প্রবাহের মত স্থির অচঞ্চল-মন্থর

উল্লেখপঞ্জী

১। আমার যৌবন,। বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ,। ৪র্থ খণ্ড,। পৃ•৪০০

২। সম্পাদকীয়,। বুদ্ধদেব বসু,।'কবিতা' পত্রিকা,। আষাঢ়, ১৩৪৮ সংখ্যা

৩। ভূমিকা,। অজিত দত্তের কবিতা সংগ্রহ,। পৃ-১/০

৪। কালকের কাব্য আর আজকের কবিতা,। অজিত দত্ত,। পূর্ব্বাশা,। কার্ত্তিক, ১৩৫৫,। পৃ•৪৮২

৫। ঐ । ঐ । ঐ । ঐ । পৃ•৪৮০

NORTH BENGAL
University Library
Raja Rammohunpur